4 MAY 2017

ড. মো. সহিদুজ্জামান

রঙের ঝামেলায় উপাচার্যরা

জাতীয় স্বার্থে শিক্ষার রাজনীতিকায়ন না করার চেতনা জাগ্রত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আলোকিত করতে ও প্রযুক্তিগতভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার যখন শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে, তখন সরকারের রাজনৈতিকভাবেই উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রায় আড়াই দশক ধরে উপাচার্য নিয়োগ রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দলীয় রাজনীতি প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছে। এর ফলে ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে উপাচার্যদের। দেখা যায়, একজন উপাচার্য দায়িত্ব নিতে না নিতেই একটি সুবিধাবাদী দল উপাচার্যকে ঘিরে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে উঠেপড়ে লাগে। অন্যদিকে উপাচার্য হওয়ার প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া গ্রুপটি ঝামেলা পাকাতে শুরু করে। অধিকন্তু স্থানীয় রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, এমপি ও সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের ঝোঁক থাকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের দিকে। ফলে দলীয় রঙে নিয়োগ পাওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা রঙের ঝামেলায় পড়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করা, বিশেষ করে সরকারদলীয় সংগঠনগুলোকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এসব সংগঠন আদর্শ ও নীতির কথা বলে ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করতে তৎপর। প্রতিটি সংগঠন তাদের পছন্দের প্রার্থীর নিয়োগ, প্রমোশন অথবা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তথা উপাচার্যকে চাপের মুখে রাখে। এ ছাড়া শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতির নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব না ফেললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অফিস সময়ে কাজকর্ম ফেলে নির্বাচনী প্রচারণা, ভোটারদের অফিস ও বাসায় প্রার্থীর একাধিকবার দেখা করা, ঘন ঘন মিটিং-মিছিল, সভা-সমাবেশে ব্যস্ত পরিবেশ নেহাতই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে একটি রাজনৈতিক অঙ্গন তৈরি করেছে, তা নিশ্চিতই বলা যায়। অফিসার ও কর্মচারীদের নির্বাচনে প্রার্থীর বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান বিজয়ী প্রার্থীকে পরবর্তী সময়ে নিয়োগ বাণিজ্য ও অনৈতিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

সরকারদলীয় প্যানেল থেকে নির্বাচিত নেতারা নিজেদের সম্ভাব্য উপাচার্য বা সহ-উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে উপাচার্যকে চাপ প্রয়োগ করেন এবং উপাচার্যকে সরিয়ে নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করার ফন্দি-ফিকিরেও লিপ্ত হন। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রতিপক্ষ সহকর্মীকে অপদস্থ, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ও কোণঠাসা করে রাখা হয়, যা বিভাগীয় শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এ ছাড়া বিভাগগুলোয় শিক্ষকদের রাজনৈতিক বিভাজন ও কোন্দলের প্রভাব বিশেষ করে মাস্টার্স ও পিএইচডির ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পড়তে দেখা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন, মিটিং-মিছিল, মানববন্ধন, ঘেরাও বা ধর্মঘটের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায়। এসবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ইমেজ সংকটে পড়লে এর দায়ভার আসে উপাচার্যের ওপর।

সরকারদলীয় অনেক ছাত্রনেতা বাইরের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় টিকতে না পেরে বেছে নেন নিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং দলীয় প্রভাব খাটিয়ে চাকরি নেন বিভিন্ন দাপ্তরিক পদে। বাস্তবতায় দেখা যায়, নিয়োগ পাওয়ার পর এসব নেতার বেশির ভাগই রাজনৈতিক চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং প্রশাসনিক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। টিআইবির তথ্যমতে, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রভাবক হিসেবে যাঁরা ভূমিকা পালন করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী, এমপি, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ। কেরানি থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত তাঁরা উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্টদের ওপর নিয়োগ দিতে চাপ দেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে ক্ষমতাসীন দলের সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে কোনো সমস্যা হয় না। বিগত সরকারের সময় ময়মনসিংহের চারজন এমপি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। এসব এমপি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখভালের অন্তরালে নিয়োগ ও টেন্ডার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। স্থানীয় মন্ত্রী ও এমপিদের অনুগত না হলে বা সুপারিশ না মানলে উপাচার্যকে সরানোর হুমকি দেওয়া হয়, কখনো কখনো ফাঁদে ফেলে হেনস্তা করা বা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

একজন উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে গঠনমূলক কাজে সময় ব্যয় করা উচিত। ছাত্রনেতা ও ক্ষমতাসীন দলের এমপি, মন্ত্রী বা প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তোষামোদ না করে নিজ নিজ কাজ ও দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে একজন উপাচার্যকে দলীয় চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে; পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সিন্ডিকেটে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পরিবর্তে স্থানীয় শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা ও গবেষণায় খ্যাতি আছে এমন ব্যক্তিকে রাখতে হবে। উপাচার্য যদি নিয়মনীতি মেনে এবং নৈতিকতা ও আদর্শ দিয়ে কাজ করেন, তাহলে কেউ অনৈতিক আবদারের সুযোগ পাবেন না। স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে দল-মত, স্থান-কাল, স্বজনপ্রীতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক একসঙ্গে কাজ করলে বাইরের কোনো শক্তিই প্রভাব ফেলতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ অনুসরণ করে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনজনের একটি উপাচার্য প্যানেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (রাষ্ট্রপতি) একজনকে উপাচার্য হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেবেন। নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পেশাগত দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করবেন। অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন উপাচার্যের অবস্থান আচার্য বা রাষ্ট্রপতির পরে। উপাচার্যদের এই পদের ভারত্ব, দায়দায়িত্ব, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে হবে এবং যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। একজন উপাচার্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন, বিশেষ প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। বছরে অন্তত একবার উপাচার্য (ভিসি) সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি, সুবিধা-অসুবিধা ও পরিকল্পনা সরকার ও দেশবাসীকে তুলে ধরবেন। রাজনীতি করার অধিকার সবারই আছে। তবে পেশাগত দায়িত্ব আর রাজনীতি কোনোভাবেই এক করা যাবে না। শিক্ষার রাজনৈতিকীকরণ থেকে সরে এসে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া এই কলঙ্ক থেকে উত্তরণের পথ নেই। সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিকভাবেই উপলব্ধি করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে শিক্ষার রাজনীতিকায়ন না করার চেতনা জাগ্রত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আলোকিত করতে ও প্রযুক্তিগতভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার যখন শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন সরকারের রাজনৈতিকভাবেই উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় কোনো পদক্ষেপ কাজে আসবে না। একজন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা, যাঁর ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দ নির্ভর করে। তাই উপাচার্যদের রঙের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। রং দেখে উপাচার্য নিয়োগ না করে মোটিভেশন, পটেনশিয়ালিটি, পার্সোনালিটি ও লিডারশিপ কোয়ালিটি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারবে এমন ব্যক্তিকেই উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
szaman@bau.edu.bd